পঞ্চদশ অধ্যায়

পরিবেশ ও উন্নয়ন

জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বাংলাদেশে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতই পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে দূষণমুক্ত সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকার 'রূপকল্প- ২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত রাখা, দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং দেশের পানি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষার লক্ষ্যে পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs)এর আওতায় নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সঠিকভাবে যাচাই, চিহ্নিত ও পর্যালোচনাপূর্বক এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009 (BCCSAP 2009) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার নিজস্ব তহবিল হতে বরাদ্দ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত ফান্ডে ৩১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilance (IBFCR' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় ১,৮৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা প্রণয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০ প্রবর্তন করাসহ দাতা দেশ/সংস্থাসমূহের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, ওজোনস্তর রক্ষা এবং পরিবেশকে সার্বিকভাবে দূষণমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো বাস্তবায়ন এবং National Biodiversity Strategy and Action Plan কে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বৈচিত্র্যময় ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ দেশ। ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, নগরায়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনসহ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের অবক্ষয়ের ফলে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশের প্রতিবেশও হুমকির সম্মুখীন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবেশগত এ সকল সমস্যা হতে উত্তোরণপূর্বক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই, পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত কিয়োটো প্রটোকলের নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত প্রথম কোন উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ডিসেম্বর ২০০৯ এ কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে বাংলাদেশ বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্প বিপ্লব পূর্ব সময়ের তুলনায় ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উন্নত বিশ্বের প্রতি আহবান জানায়। ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানোর লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল বিশ্বের ১৯১টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত (ratified) হয়েছে। ২০১২ সালে Kyoto Protocol-এর প্রথম Commitment Period শেষ হয়েছে। বর্তমানে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধির ফলে Kyoto Protocol স্বাক্ষরকারী উন্নত দেশসমূহের বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের

অবদান মাত্র ২৭ শতাংশ। ইতোমধ্যেই রাশিয়া, জাপান ও কানাডা Kyoto Protocol থেকে বের হয়ে আসার ঘোষণা দেয়। সে প্রেক্ষাপটে Kyoto Protocol এর বৈশ্বিক গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণে অবদান মাত্র ১৫ শতাংশে নেমে আসবে। গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমণকারী বিশ্বের প্রথম ১০টি দেশের তালিকা সারণি ১৫.১ -এ দেয়াহলোঃ

সারণি ১৫.১ঃ বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহের গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের বিবরণ।

ক্র. নং	দেশ	বার্ষিক মোট CO_2 নির্গমণ,২০১২ (মিলিয়ন মেট্রিক টনস)	শতকরা নির্গমণ
১	চীন	৮,১০৬.৪৩	২৫.০৮
২	যুক্তরাষ্ট্র	৫,২৭০.৪২	১৬.৩১
৩	ভারত	১,৮৩০.৯৩	৫.৬৬
৪	রাশিয়া	১,৭৮১.৭১	৫.৫১
৫	জাপান	১,২৫৯.০৫	৩.৮৯
৬	জার্মানী	৭৮৮.৩২	২.৪৩
৭	দক্ষিণকোরিয়া	৬৫৭.০৯	২.০৩
৮	ইরান	৬০৩.৫৮	১.৮৬
৯	সৌদী আরব	৫৮২.৬৭	১.৮০
১০	কানাডা	৫৫০.৮২	১.৭০

উৎসঃEIA (Energy Information Administration),২০১৫।

জলবায়ু সম্মেলন

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ জাতিসংঘের অধীনে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন নেগোসিয়েশনের সাথে বরাবরই ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, জলবায়ু অর্থায়ন, জলবায়ু প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তর, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর পুণর্বাসন ও স্থানান্তর বিষয়ক বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

প্যারিসে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত ২১ তম বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP21) এ গৃহীত প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথমসারির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জাতিসংঘের সদর দপ্তরে ২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের ১৯৫টি সদস্য দেশের মধ্যে বাংলাদেশসহ ১৭৫টি দেশ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি স্বাক্ষর করে, যা আন্তর্জাতিক কোনো চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ঘটনা। এ পর্যন্ত (১৪ মার্চ ২০১৭ অনুযায়ী) ১৯৪টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন উক্ত চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছে এবং বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ মোট ১৩৪টি সদস্য দেশ (যা ৫ বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণের ৮২ শতাংশ রিপ্রেজেন্ট করে) অনুস্বাক্ষর করেছে। গত ৪ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে। প্যারিস বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন-২০১৫ এর মূল অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

- আইনি বাধ্যবাধকতামূলক চুক্তি
- তাপমাত্রা সীমিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা
- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
- অভিযোজনের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা (Global Goal on Adaptation) গৃহীত হয়েছে;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং লস এ্যান্ড ড্যামেজ
- উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রশমন এবং অভিযোজনের জন্য public fund এবং অনুদান ভিত্তিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো (UNFCCC)-র আওতায় গত ৭ নভেম্বর হতে ১৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে মরক্কোর মারাকেশ শহরে ২২ তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশসূহের পক্ষে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ২২ তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন COP 22 এর মূল লক্ষ্য ছিল প্যারিস চুক্তিতে গৃহীত বিভিন্ন বিষয় বা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নানাবিধ কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী (modalities, procedures and guidelines) প্রণয়নের উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করা। মারাকেশ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত এপেক্স বডি Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA)-এর ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যবিধি, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশাবলী ২০১৮ সালের মধ্যে প্রণয়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে এতদসংক্রান্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনেরিও-তে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত ইউনাইটেড ন্যাশনস কনভেনশন অন বায়োলজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি) এর বাংলাদেশ অনুসমর্থনকারী। এই কনভেশনের মূল লক্ষ্য হল জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ। সিবিডি'র অংশীদার হিসেবে গত ০২-১৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ সময়ে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিত

সিবিডি'র ১৩ তম কনফারেন্সে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রতিকূল প্রভাবগুলোর কারণে ও সমুদ্র উপকূলীয় দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির নাজুক পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুর গুরুত্ব অনুধাবন করে যথাযথ ও পরিকল্পিত সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু নীতি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছেঃ

- National Adaptation Programme of Action (NAPA) (2005 and revised 2009)
- Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) (2009)
- Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMA) প্রণয়ন
- পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে Climate Change Unit প্রতিষ্ঠা

এছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট তিনটি তহবিল গঠন করা হয়েছেঃ

- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (Bangladesh Climate ChangeTrust Fund-BCCTF):** জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘটমান বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন এবং স্থানচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের প্রয়োজন বিবেচনা করে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে তহবিল গঠন করা হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৩১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ডিসেম্বর ২০১৬ তে এ তহবিলের কার্যক্রম শেষ হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৪৭২টি (সরকারি ৪০৯টি ও বেসরকারি ৬৩টি) প্রকল্পে প্রায় ২,৬৫৯.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে সরকারি ১৪৯টি প্রকল্প এবং বেসরকারি ৫৭টি সহ মোট ২০৬টি প্রকল্পের কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতা তহবিল (Bangladesh Climate Change Resilience Fund- BCCRF):** Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) কে সহায়তা করা ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার তহবিল যোগানোর জন্য ৪টি উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিলটি মূলত ২০০৮ সালে Multi Donor Trust Fund (MDTF) নামে যাত্রা শুরু করেছিল। পরবর্তীকালে আরও ৩টি উন্নয়ন সহযোগী BCCRF এ ট্রাস্ট ফান্ডে যোগদান করে। বর্তমানে BCCRF-এ অনুদান প্রদানকারী সাতটি উন্নয়ন সহযোগী হলো: ডিএফআইডি, ডেনমার্ক, সুইডেন, ইইউ, সুইজারল্যান্ড, অসএইড এবং ইউএসএইড। BCCRF এর ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়ন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাংক অনুদান প্রদানকারী উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষে ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কারিগরী এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করবে। উন্নয়ন সহযোগী হতে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অনুদানের মোট পরিমাণ ১৮৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। BCCRF এর আওতায় অদ্যাবধি ৮ টি প্রকল্পে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২টি, বন অধিদপ্তরের ১টি, এলজিইডি'র ১টি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১টি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ১টি, পিকেএসএফ'র ১টি, IDCOL ১টি) মোট ১৫৩.৮ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
- **বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সক্ষমতার জন্য কৌশলগত কর্মসূচি (Strategic Programme for Climate Resilience (SPCR) Bangladesh):** ২০১০ সালের অক্টোবরে MDB হতে বাংলাদেশের জন্য ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের (এর মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ ৬০ মিলিয়ন ডলার ও অনুদান ৫০ মিলিয়ন ডলার) তহবিল অনুমোদিত হয়। এর আওতায় পিপিসিআর-এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এলাকায় অভিযোজনমূলক (adaptation) পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ তহবিলের বিভিন্ন কম্পোনেন্টের দায়িত্বে রয়েছে বিশ্বব্যাংক

ও আইএফসি এবং তদারকির প্রধান দায়িত্বে রয়েছে এডিবি।

অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilance (IBFCR)' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় ১,৮৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের মেয়াদ ২০১৫ সালে শেষ হওয়ায় নতুন একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা (The Future We Want) নিয়ে ২০১৪ সালের ১৯ জুলাই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি টেকসই উন্নয়ন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সময়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals, SDGs) চূড়ান্ত হয়, যার দাপ্তরিক নাম হলো Tranforming our World:the 2030 Agenda for Sustainable Development। 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)' 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি)'কে প্রতিস্থাপন করবে যা ২০১৫-২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) এর ১৭ টি লক্ষ্য এবং ১৬৯টি উদ্দেশ্য রয়েছে। ১৭টি মূল লক্ষ্যের বিষয় হচ্ছে-দারিদ্র্য, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জেন্ডার ইকুইটি, পানি, শক্তি (জ্বালানি), অর্থনীতি, অবকাঠামো, বৈষম্য (Inequality), বাসস্থান (Habitation), জলবায়ু, ভোগ (Consumption), সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান (Marine-ecosystems), বাস্তুসংস্থান (Ecosystems), প্রতিষ্ঠান ও স্থায়িত্ব (Sustainability)।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বা Millennium Development Goals (MDGs) এর বাস্তবায়নে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় SDGs প্রণয়নের ক্ষেত্রে ও বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। SDGs প্রণয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ হতে সকল সদস্য রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার নিকট প্রস্তাব আহবান করা হলে স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে জুন,২০১৩ মাসে বাংলাদেশের প্রস্তাবনা জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয়। ১১টি অভীষ্ট লক্ষ্য (Goals), ৫৮টি লক্ষ্যমাত্রা (Targets) ও ২৪১টি সূচক- এর আলোকে প্রণীত প্রস্তাবনাটির মধ্য হতে ১০টি লক্ষ্যই জাতিসংঘের চূড়ান্তকৃত SDG-তে প্রতিফলিত হয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১১টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এর অর্জিত লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করাসহ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য সমূহ (এসডিজি)-এর প্রায় ৮২ শতাংশ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

SDGs এর ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্য এবং অন্তগত ১৬৯টি লক্ষ্য মাত্রার সাথে সমন্বিত করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট SDG লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (Target) প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যা A handbook 'Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with a 7th Five Year Plan (2016-20)- আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সরাসরি লীড মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে SDG লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়নের সাথে জড়িত। ৩৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ কোলীড হিসেবে এবং ৫১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এসোসিয়েট হিসেবে কাজ করবে। যথাযথভাবে SDGs মনিটরিং ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির জন্য 'Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective' প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, SDGs- এর নির্ধারিত ২৩০টি সূচকের বিপরীতে ৭০টি সূচকের তথ্য বাংলাদেশে বিদ্যমান উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ পদ্বতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে এবং ১০৮টি সূচকের ক্ষেত্রে বিদ্যমান উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ পদ্বতিতে পরিবর্তন করার মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে। অতিরিক্ত ৬৩টি সূচকের ক্ষেত্রে নতুন জরিপ বা শুমারির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে। কারণ, এ সকল সূচকের উপাত্ত/তথ্য সংগ্রহ প্রণালী এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। এছাড়া SDG লক্ষ্যমাত্রা সমূহ (Target) সঠিকভাবে যাচাই, চিহ্নিত ও পর্যালোচনা পূবক SDGs বাস্তবায়নের কর্মকৌশল প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অভিযোজন ও প্রশমন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় অভিযোজন (adaptation) ও প্রতিকারমূলক (mitigation) কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন আছে। এখানে উল্লেখ্য যে , অন্যান্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার গৃহীত কার্যক্রমও পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। ফলে বাংলাদেশের জন্য একটি নিরাপদ ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সকল নীতি, কৌশলপত্র, প্রকল্প ইত্যাদির আলোকে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'স্ট্রেংদেনিং দি এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট্রি এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্যাপাসিটিজ অব দি মিনিস্ট্রি অব এনভায়রনমেন্ট এন্ড ফরেস্টস এন্ড ইটস এজেন্সিজ' শীর্ষক প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ আউটপুট হিসেবে বাংলাদেশের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে একটি সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (Country Investment Plan-CIP) প্রণয়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৫টি গ্রুপে (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন; বনসম্পদ; কৃষি, মৎস্য ও খাদ্য নিরাপত্তা; অর্থনীতি ও অবকাঠামো উন্নয়ন; এবং জেন্ডার) ভাগ করে এ সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল নীতি/আইন/কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক সক্ষমতা, দ্বৈততা, পরস্পর বিরোধিতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক প্রয়োজনীয় প্রকল্প চিহ্নিতকরণের কাজ চলছে। CIP প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। CIP এর প্রাথমিক খসড়া প্রণয়নের পর সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা, পেশাজীবী, সাধারণ জনগণ সকলের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে আঞ্চলিক পরামর্শক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই জাতীয় পরামর্শক কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম

ক্রমবর্ধমান নগরায়নের ফলে অবকাঠামো নির্মাণ এবং যানবাহন ও কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ক্রমাগতভাবে। মানব স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের বিরূপ প্রভাবসহ অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব নিরসনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশে উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটার প্রচলন, যানবাহন ও কলকারখানা সৃষ্ট ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনাসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বায়ুদূষণ জনিত পরিবেশগত সমস্যা নিরসনে সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

বায়ু দূষণ মনিটরিং

- বাংলাদেশের বড় শহরগুলোতে বায়ু দূষণ সমস্যা প্রকট। তাই বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় 'নির্মল বায়ু এবং টেকসই পরিবেশ'Clean Air & Sustainable Environment (CASE)-প্রকল্পের আওতায় ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহরগুলোতে সার্বক্ষণিক বায়ু মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে । প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের অধীন বায়ু দূষণ মনিটরিং, বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরের বায়ুদূষণ মাত্রা পরিমাপ করার নিমিত্ত ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী ও খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট ও বরিশাল শহরে ১টি করে সারাদেশে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন চালু রয়েছে।
- এ সকল স্টেশনের মাধ্যমে উক্ত শহরগুলোতে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুকণা, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি) পরিমাণ সার্বক্ষণিকভাবে পরিমাপ করা হচ্ছে। বস্তুকণা পরিমাপের আওতায় এসপিএম, পিএম১০, পিএম ২.৫ পরিবীক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বায়ুর মানের অবস্থা নিরূপণ করা সম্ভব হয়।
- ২০১৪ সালে সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে বস্তুকণা ১০ ও বস্তুকণা ২.৫ এর মান বছরের অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি থাকে এবং প্রায়শই নির্ধারিত বায়ুর মানমাত্রা অতিক্রম করে। এই অধিক মাত্রার বায়ুদূষণের মূল কারণ হল শুষ্ক মৌসুমে ইটের ভাটা সমূহ চালু হয়, বৃষ্টিপাত কম হয় এবং বাতাসের গতিবেগ কম থাকে এই কারণে রাস্তাঘাটেও বস্তুকণার উপস্থিতি প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে বায়ুতে বস্তুকণার পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার মধ্যে থাকে।

যানবাহন হতে সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ

- যানবাহনের ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

(সংশোধন ২০১০) অনুসারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা যায়। এছাড়া মটরযান আইন, ১৯৮৩ এর আওতায় পুলিশ প্রশাসন জরিমানা আদায় করতে পারে। ডিজেল চালিত পুরাতন মোটরযান বস্তুকণা নিঃসরণের (Particulate Matter) আরেকটি প্রধান উৎস। যানবাহন সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে গাড়ীর ধোঁয়া পরিবীক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করছে এবং অধিক দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ইট ভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ:

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে নির্মাণ শিল্পের ব্যাপকতার কারণে দেশে ইটের চাহিদাও বহুগুণে বেড়েছে । ফলে যততত্র ইটের ভাটা গড়ে উঠেছে ।এ সকল উৎস থেকে সৃষ্ট বায়ুদূষণও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে ক্রমাগতভাবে।

- **ইটভাটা স্থাপন আইন যুগোপযোগিকরণ:** বায়ু দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হলো ইট ভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ। ইটভাটা থেকে দূষণ কমানোর লক্ষ্যে পুরাতন পদ্ধতির ইট ভাটার পরিবর্তে জ্বালানি সাশ্রয়ী, বায়ু দূষণরোধে কার্যকরী ও আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশবান্ধব ইটভাটা স্থাপনের লক্ষ্যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩'১ জুলাই ২০১৪ হতে কার্যকর করা হয়। এ আইন অনুযায়ী পুরাতন পদ্ধতির ইটভাটাসমূহকে পরীক্ষিত উন্নত পরিবেশসম্মত এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে রূপান্তর করে ইট পোড়ানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। বাস্তবতার নিরিখে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩'-এর সংশোধনীর প্রস্তাবনাটি চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে রয়েছে।

- **আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটায় রূপান্তর:** পুরাতন পদ্ধতির সকল ইটভাটাকে ৩০ জুন, ২০১৪ খ্রিঃ হতে পরিবেশবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তিতে রূপান্তরের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে দেশে ৪,২২৭ টি ইটভাটা আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিচালিত হচ্ছে যা দেশে বিদ্যমান ইটভাটার ৬৪ শতাংশ ।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম:

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশ দূষণের মাত্রা সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের মধ্যে রাখার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ও প্রযোজ্য ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসরণ করা হয়। দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার ব্যবস্থা (Effluent Treatment Plant-ETP), শব্দ প্রতিবন্ধক ব্যবস্থা (Sound Barrier), বায়ু পরিশোধন ব্যবস্থা (Air Treatment Plant-ATP) স্থাপনসহ সকল প্রকার Mitigation Measures বাস্তবায়ন করার পর এবং নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার শর্ত সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বহুতল আবাসিক ভবনসমূহে Rain Water Harvesting ব্যবস্থা ও পয়:বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (Sewage Treatment Plant -STP) স্থাপনের এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা (Zero Discharge Plan) গ্রহণের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হচ্ছে।

শিল্প দূষণ নিয়ন্ত্রণ মূলক কার্যক্রম

- **ইটিপি (ETP) স্থাপন:** পানি দূষণ রোধে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (ETP – Effluent Treatment Plant) স্থাপনে বাধ্য করতে পরিবেশ অধিদপ্তর অধিকহারে মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ফলে অধিকাংশ পানি দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে ইটিপি নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ইটিপি আছে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১,৪৩৯টি এবং ইটিপি বিহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৩০টি।

- **এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম:** বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে

আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। পরিবেশ দূষণের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ২৩৫টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে ১০.৪১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আরোপপূর্বক ৫.০৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে এবং একই সাথে দূষণকারী ১১ টি প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ ও ৩৪ টি প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ/গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

- **নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযানঃ** নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ বন্ধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সারাদেশে ৮টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্সসমূহ নিয়মিত নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে সর্বমোট ১,০৩৯ টি প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করে ১১৮.৯৩ টন নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ জব্দ ও প্রায় ৮৯.০২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া জনসচেতনা সৃষ্টির পাশাপাশি পলিথিন শপিং ব্যাগ মুক্ত বাজার ঘোষণার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি বাজারকে পলিথিন শপিং ব্যাগ মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

- শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বিসিক এর তত্বাবধায়নে রাজধানীর হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারি শিল্পসমূহকে কেন্দ্রিয় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপনপূর্বক ঢাকার বাহিরে সাভারের হরিণধারায় স্থানান্তরের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সাভারে স্থানান্তরে বাধ্য করার লক্ষ্যে এপ্রিল ২০১৭ তে সকল ট্যানারী কারখানার বিদ্যুৎ/গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।

- বৃহত্তর ঢাকা জেলায় শিল্প কারখানার সংখ্যা ও দূষণের মাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শব্দ দূষণ রোধ ও শব্দ দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Survey of Noise Level in Seven Divisional Headquarters Under the Integrated and Participatory Program to Control Noise Pollution' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

- **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ** বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন (ফেজ-১) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম ২০১০ সালে শুরু করে। প্রকল্পের অধীন ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন (থ্রি আর) পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও গৃহস্থালী বর্জ্য কর্তৃক দুর্গন্ধ ছড়ানো ও গ্রীনহাউজ গ্যাস (মিথেন) নির্গমন সমস্যা নিরসণ পূর্বক পরিবেশ সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শহরের জৈব আবর্জনা ব্যবহার করে 'প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম' শীর্ষক পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের অধীনে নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ময়মনসিংহ পৌরসভায় ইতোমধ্যে ২টি কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মিত হয়েছে এবং রংপুর সিটি কর্পোরেশন ও কক্সবাজার পৌরসভায় ২টি কম্পোস্ট প্লান্ট নির্মাণাধীন আছে। প্লান্টে শহরের জৈব আবর্জনা এ্যারোবিক পদ্ধতিতে কম্পোস্ট সারে রূপান্তর করা হয়।

পানি ও পরিবেশ

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের অন্যতম প্রধান নিয়ামক শত শত নদী ও জলাশয় দেশের ইকোসিষ্টেমকে সচল ও উৎপাদনমুখী রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ নদী ও জলাভূমি বিভিন্ন রকম জলজীবের আবাসস্থল। নদীতে পানির প্রবাহ নির্ভর করে ঋতু, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও উজানের প্রবাহের উপর।

'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা-১৯৯৭' অনুযায়ী দেশের প্রধান প্রধান নদী যেমন পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ধলেশ্বরী, সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানির গুণগত মান সারা বছরই গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে আছে। কিন্তু ঢাকার পারিপার্শ্বিক নদীসমূহে যেমন বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীর পানির গুণগতমান গ্রহণযোগ্য সীমার বাইরে বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে যখন নদীতে পানি প্রবাহ খুব কম থাকে তখন কোন কোন স্থানের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ শূন্য থাকে যা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের বেঁচে থাকার জন্যে মোটেও উপযুক্ত নয়। এ জন্য এ সকল নদীর প্রতিবেশগত অবস্থা পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীর 'ফোরশোর' এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে নদীর পানির মান মনিটরিং করে আসছে। ২৭টি নদীর পানি ৬৩টি স্থানে মনিটরিং করা হয়। মনিটরিং প্যারামিটারগুলি †ঃ pH, Chloride, Turbidity, Total Dissolved

Solid (TDS), Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Chemical Oxygen Demand (COD)।

উল্লিখিত প্যারামিটার অনুসারে মনিটরিং ফলাফল হতে দেখা যায় যে, ২০১৬ সালে বাংলাদেশের বড় বড় নদী যেমন, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, ধলেশ্বরী, সুরমা ইত্যাদি নদীর পানির গুণগত মান পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে ছিল। DO, BOD এবংCOD এর মানের ভিত্তিতে দেখা যায় ঢাকা শহরের চারপাশের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা এবং তুরাগ নদীগুলো শুষ্ক মৌসুমের চার/পাঁচ মাস খুব দূষিত থাকে। এ সব নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রায় শূন্য থাকে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা নদীতে উচ্চ মাত্রার BOD ৪০ মি:গ্রা:/লি: (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৬ মি:গ্রা:/লি: বা তার নিম্নে), COD ১২৬ মি:গ্রি:/লি: (UNECE standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৩৫ মি:গ্রা:/লি: বা তার নিম্নে). Chloride ১২৫ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান২৫০ মি:গ্রা:/লি:) এবং TDS ৬৪১ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৫০০ মি:গ্রা:/লি:) পাওয়া যায়।

২০১৬ সালে ময়ূরী, রূপসা, পশুর ও খেকশিয়ালী নদীতে উচ্চ মাত্রায় Chloride, TDS, Turbidity পাওয়া গিয়েছে। পশুর নদীতে সর্বোচ্চ Chloride ১২,৬৯৭ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ২৫০ মি:গ্রা:/লি:) এবং TDS ১৬,৩৭০ মি: গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান৫০০ মি:গ্রা:/লি:) পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত নদীতে বেশি Turbidity লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ Turbidity-র কারণে পানির স্বচ্ছতা হ্রাস পায় ফলে একদিকে পানিতে ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদন হ্রাস পায়, অন্যদিকে river bed এ পলি জমে। খেকশিয়ালী নদীতে সর্বোচ্চ Turbidity 136.3 NTU (গ্রহণযোগ্য মান ১০ NTU পর্যন্ত) পাওয়া গিয়েছে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্লান হালনাগাদ: জীববৈচিত্র্য সনদ বা কনভেনশন অন বায়োলোজিক্যাল ডাইভারসিটি (সিবিডি)-এর অংশীদার হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পরিপূরণে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত জীববৈচিত্র্য কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০ এর আলোকে জাতীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের লক্ষ্যে National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP), 2016-2021 প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, Biodiversity National Asseessment 2015 প্রণয়ন এবং জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত Clearing House Mechanism (CHM) বা ওয়েব-বেইজড তথ্যভান্ডার তৈরি করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন,২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে।

দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২০ এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এ কর্মপরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো:

- **প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা সংরক্ষণ (**Ecologically Critical Area-ECA): প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬ জারি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার বাদনাতলী ইউনিয়ন থেকে উৎপত্তি হয়ে কর্ণফুলী মোহনাতে শেষ হওয়া হালদা নদীকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা (ECA) ঘোষণা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- **গ্রাম সংরক্ষণ দল গঠনঃ** হাকালুকি হাওর এবং কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত ও সোনাদিয়া দ্বীপ ইসিএ-তে এলাকার জনগণকে সংগঠিত করে সর্বমোট ৭৪টি গ্রাম সংরক্ষণ দল (Village Conservation Group, VCG) গঠন করা হয়েছে, দলগুলোর সদস্যদের মাধ্যমে পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। গ্রাম সংরক্ষণ দলের দপ্তর হিসেবে এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ-জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রমসহ এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে হাকালুকি হাওরে ৬টি এবং কক্সবাজারে ৪টি সহ মোট ১০টি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। কেন্দ্রে সপ্তাহে একটি দিন নির্ধারিত থাকবে এলাকার নারীদের জন্য যেদিন কেবলমাত্র নারীরাই তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনার জন্য কেন্দ্রটি ব্যবহার করবেন। প্রতিটি প্রতিবেশ সংরক্ষণ কেন্দ্রে একটি জীববৈচিত্র্য মিউজিয়ামও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

- **ম্যানগ্রোভ বন সৃজন ও সংরক্ষণঃ** কক্সবাজার জেলায় ম্যানগ্রোভ বন (প্যারাবন) সৃজন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। বালিয়াড়ি সংরক্ষণ করা হয়েছে।

- **জলজ বন সৃজন ও সংরক্ষণঃ** হাকালুকি হাওরে ৫০০ হেক্টর জলজ বন সংরক্ষণ এবং ১০ হেক্টর জলজ বন সৃজনের মাধ্যমে হাওরের প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। এই বন মাছসহ বিভিন্ন জলজ প্রাণীর নার্সারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বর্ষা মৌসুমে জলজ প্রাণীর আবাস্থল ও শুষ্ক মৌসুমে বন্যপ্রাণী এবং স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখির নিরাপদ আবাস।
- **বিল-খাল পুনঃখননের মাধ্যমে জলাভূমির অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠাঃ** হাকালুকি হাওরে বিল-খাল পুনঃখননের মাধ্যমে প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও মৎস্য সম্পদসহ জলজ সম্পদের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ৯টি জলাভূমির অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- **সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ বরাবর সবুজবেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাছের চারা রোপণঃ** প্রবল ঢেউয়ের আঘাত থেকে হাওর এলাকার বসতবাড়ি ও সম্পদ রক্ষার জন্য হাকালুকি হাওরে ১০টি সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ বরাবর সবুজবেষ্টনী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের আওতায় গৃহীত কার্টাহেনা প্রোটোকল অন বায়োসেফটি (জীবনিরাপত্তা চুক্তি)-এর অংশীদার। চুক্তির বাধ্যবাধকতা পরিপূরণের লক্ষ্যে জাতীয় জীবনিরাপত্তা কর্মকাঠামো (National Biosafety Framework) বাস্তবায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ জারি করা হয়েছে।

বনের জীব-বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের অংশ হিসাবে ঢাকার অদূরে 'বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, গাজীপুর' এবং কক্সবাজার এ 'বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, কক্সবাজার' নামে দুইটি বণ্যপ্রাণী সাফারী পার্ক এবং চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় 'শেখ রাসেল এভিয়ারী ইকো-পার্ক' ছাড়াও ১৭টি জাতীয় উদ্যান, ২০ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তা ছাড়া শকুন সংরক্ষণের জন্য দুইটি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষনা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের গাছ আহরণ বন্ধ রাখা ছাড়াও সৃজিত বনায়নের পুরাতন গাছ আহরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। সরকারি খাস জমির প্রাকৃতিক গাছ আহরণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বন্যপ্রানী নিধন ও পাচার এবং ক্রয় ও বিক্রয় রোধে পুলিশ,কাষ্টমস, কোস্টগার্ড ও বনবিভাগ সম গঠিত বন্যপ্রাণি ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিট কার্যকরী ভূ পালন করছে। বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এর ধারা ২০(১) এর ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এলাকায় ১,৭৩৮.০০ বর্গকিলোমিটার এর মেরিন প্রটেকক্টেড এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সুন্দরবনে জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই রাখার মাধ্যমে সুন্দরবনের পর্যটন আকর্ষণ ক্ষমতা যাতে আবহমান কাল রক্ষা করা যায় সেই লক্ষ্যে যথেচ্ছ ভ্রমণের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আবশ্যক। সুন্দরবনে পর্যটকদের সংখ্যা কোনভাবেই যেন বহন ক্ষমতাকে অতিক্রম করতে না পারে তার জন্য সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ক্যামেরা ট্রাপিং পদ্ধতিতে সুন্দরবনের টাইগার এস্টিমেট করা হয়েছে। কুমির এবং হাতির এস্টিমেটও করা হয়েছে। কুমির ও হাতি সংরক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রাকৃতিক বনকে আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং বিদ্যমান জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ২১টি সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায়বন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অধিক কার্যকর করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে এবং সামাজিক বনায়নের অধিক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হয়েছে। রক্ষিত এলাকাসমূহের প্রবেশ ফি হতে অর্জিত আয়ের ৫০ শতাংশ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়নে বরাদ্দ করা হচ্ছে।

ওজোনস্তর সংরক্ষণ

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষর করে এবং প্রটোকলের লন্ডন, কোপেনহেগেন, মন্ট্রিল ও বেইজিং সংশোধনীসমূহ যথাক্রমে ১৯৯৪, ২০০০, ২০০১ ও ২০১০ সালে অনুমোদন করে। প্রটোকলের শর্তানুযায়ী ওজোন ক্ষয়কারী সিএফসি-এর পর্যায়ক্রমিক নিয়ন্ত্রণ ১৯৯৯ সালের ১লা জুলাই থেকে শুরু হয়েছে এবং ২০১০ সালে তা শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হয়েছে।বর্তমান প্রটোকল অনুযায়ি এইচসিএফসি ফেইজ আউটের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে 'ওজোন সেল' গঠন করা হয়েছে এবং মন্ট্রিল প্রটোকল মাল্টিলেটারেল ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকার ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

ত বছরগুলোতে ওজোনস্তর রক্ষায় গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

- ওডিএস এর আমদানি ও ব্যবহার এর পর্যায়ক্রমিক হ্রাসের জন্য 'ওজোনস্তর ক্ষয়কারী

দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০০৪' জারি করা হয়েছে যা সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সময়ে সংশোধিত হয়েছে;

- ওজন স্তর রক্ষায় বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরে 'রিনিউয়াল অব ইনষ্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওজোন ডিপেস্নটিং সাবস্টেন্সেস (ফেজ-৭)' প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত ওজোন সেলের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার জন্য এবং কান্ট্রি প্রোগ্রাম-এ বর্ণিত ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী ও ব্যবহার পর্যায়ক্রমিক হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।
- 'ইমপ্লিমেনটেশন অব এইচসিএফসি ফেজ-আউট ম্যানেজমেট প্লান ইউএনইপি- কম্পোন্যান্ট (স্টেজ-১)' প্রকল্পের মাধ্যমে মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রিফ্রিজারেশন সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদান; সার্ভিসিং সেক্টরে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের জন্য Code of Practice প্রণয়ন ও বিতরণ; ওডিএস এর আমদানি-রফতানি নিয়ন্ত্রণ ও চোরাচালান রোধের জন্য কাস্টমস ও সংশ্লিষ্ট আইন বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় Identifier সরবরাহ এবং ওজোনস্তর ক্ষয়রোধের লক্ষ্যে আমদানিকারক, ব্যবহারকারী ও জনগণের মধ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং

পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং মূলত ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের নীতি নির্ধারণী উদ্যোগ, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রমের তদারকী, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পুণঃঅর্থায়ন সুবিধা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যাবলী। বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি ২০১১ এ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন্স জারি করে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং সংক্রান্ত প্রথম নীতি নির্দেশনা। ২০১৬-১৭ অর্থব (ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগু সর্বমোট ২৫৩.১৫ বিলিয়ন টাকা পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন করেছে, তার মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিবেশবান্ধব অর্থায়নের পরিমাণ ১৭.৮৮ বিলিয়ন টাকা। উল্লিখিত সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলো ৩৮,১২৭টি রেটিংকৃত প্রকল্পের মধ্যে ৩৩,০৪৫টি প্রকল্পে মোট ১,০৬৬.০৯ বিলিয়ন টাকা অর্থায়ন করেছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে টেকসই ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ও সিএসআর কার্যক্রম সমন্বিতভাবে এবং অধিকতর ফলপ্রদ ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ইউনিট নামে একটি সমন্বিত ইউনিট গঠন, কর্মপরিধি ও সামগ্রিক সাংগঠনিক কাঠামো সুনির্দিষ্টকরণের লক্ষ্যে নির্দেশনা জারি করা হয়;ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর অর্থায়নের সময় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতা কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে ইটিপি স্থাপন ও চালু রাখার বিষয়টি আবশ্যিকভাবে নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশনা জারি করা হয়। সৌর শক্তি, বায়ো-গ্যাস প্লান্ট, এফলুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর মতো পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের অর্থায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিজস্ব তহবিল হতে ২০০৯ সালে পরিবেশবান্ধব পণ্য/খাতের জন্য ২ বিলিয়ন টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কীম তৈরি করে।

'নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও পরিবেশবান্ধব অর্থায়নযোগ্য খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম' এর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে মোট ৭টি গ্রিন প্রোডাক্ট/পণ্যে - সোলার হোম সিস্টেম, বায়োগ্যাস, কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট (CETP), Hybrid Hoffman Kiln (HHK) প্রযুক্তি সম্পন্ন ইট প্রস্তুত, স্লারি হতে জৈবসার প্রস্তুত, কারখানার কর্মপরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

বন সংরক্ষণ

বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির আয়তন ১.৬০ মিলিয়ন হেক্টর। এর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ১.৪০ মিলিয়ন হেক্টর এবং অবশিষ্ট প্রায় ০.২০ মিলিয়ন হেক্টর উপকূলীয় অঞ্চলে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট। এছাড়াও দেশের সর্বত্র প্রায় ০.৭৭ মিলিয়ন হেক্টর বসতবাড়ি এবং প্রান্তিক পতিত ভূমি বৃক্ষাচ্ছাদনে আবৃত। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর যাগিতায় অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া র্ঠনের মাধ্যমে বর্তমানে বন ব্যবস্থাপনার প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে। দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বন মহাপরিকল্পনা ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বনাচ্ছদনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সারণি ১৫.৩ এ সার্ক দেশসমূহের বনভূমির পরিমাণের তুলনামূলক চিত্র দেয়া হলোঃ

সারণি ১৫.২ঃ সার্ক দেশসমূহের বনভূমির পরিমাণের তুলনামূলক চিত্র/পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	দেশের নাম	মোট ভূমির পরিমাণ (বর্গ কিঃমিঃ)	মোট বনভূমির পরিমাণ (বর্গ কিঃমিঃ)	বনভূমি কভারেজ (%)
১.	আফগানিস্তান	৬,৫২,৮৬০	১৩,৫০০	২.০১
২.	বাংলাদেশ	১,৩০,১৭০	১৪,২৯০	১১.০০
৩.	ভুটান	৩৮,১১৭	২৭,৫৫০	৭১.৮০
৪.	ভারত	২৯,৭৩,১৯০	৭,০৬,৮২০	২৩.৭০
৫.	পাকিস্তান	৭,৭০,৮৮০	১৪,৭২০	২.০০
৬.	মালদ্বীপ	৩০০	১০	৩.৩০
৭.	নেপাল	১,৪৩,৩৫০	৩৬,৩৬০	২৫.৪০
৮.	শ্রীলংকা	৬২,৭১০,	২০,৭০০	৩৩.২০

উৎসঃ http://data.worldbank.org/indicator,২০১৫

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, কাঠভিত্তিক শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জনগণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা জোরদার তথা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ প্রদান ও কৃষি উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২টি চলতি উন্নয়ন প্রকল্প (৯টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ৩টি কারিগরি প্রকল্প) বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন আছে যার অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ২৫৯.২০ কোটি টাকা। এছাড়া বরাদ্দবিহীনভাবে ১২ টি প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত আছে। অনুমোদিত প্রকল্পসমূ[illegible] অনুকূলে জুলাই, ২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত [illegible] হয়েছে ১৫১.৯৮ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫৯ শতাংশ।

সামাজিক বনায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত কার্যক্রম

সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম যা গ্রামীণ জনপদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সেই সাথে সামাজিক বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা,জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত প্রশমন ও অভিযোজনে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পের এবং কর্মসূচির আওতায় ৭,৬৯৪ হেক্টর ব্লক বাগান, ৮৬৯কি.মি. স্ট্রিপ বাগান এবং ৩৩.২২ লক্ষ চারা উত্তোলন করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন বিধিমালা (২০০৪) সংশোধন করে উপকারভোগীদের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সরকারি বনে উপকারভোগীদের বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সৃজিত সামাজিক বনায়ন হতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ অংশীদারদের মধ্যে বিতরণ অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য, সামাজিক বনায়ন কর্মসূচির সাথে ৫ লক্ষ এর বেশি উপকারভোগীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে । এ কার্যক্রমটি সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মহিলাদেরকে স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর হতে সহায়ক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি ব্যাপক অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম দেশের উদ্ভিদ সম্পদের উপর ট্যাক্সোনমিক গবেষণায় নিয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ফিল্ড সার্ভের মাধ্যমে কৃষিজ, বনজ, ভেষজ, ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ সকল প্রকার বৃক্ষলতা প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, সংরক্ষণ ও সংগৃহীত উদ্ভিদ সম্পদের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা। হারবেরিয়াম কর্তৃক দেশের উদ্ভিদ সম্পদের তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা "ফ্লোরা অব বাংলাদেশ" সিরিজ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। দেশের ভেষজ সম্পদ, উদ্ভিদবিদ্যার চর্চা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য বৃক্ষসম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে হারবেরিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সঠিক ও সুষ্ঠু পরিচর্যার মাধ্যমে এসকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে হারবেরিয়ামে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

[illegible]লাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ২০১৬-১৭ অর্থবছরে [illegible]য়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে উদ্ভিদ সমীক্ষা কার্যক্রম (Botanical Survey Activities), উদ্ভিদ সনাক্তকরণ

(Plant Identification), উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ (Plant Specimen Preservation), সনাক্তকরণকৃত উদ্ভিদের ডাটাবেজ তৈরিকরণ, Flora of Bangladesh প্রকাশনা কার্যক্রম, উদ্ভিদ প্রজাতিকে বাংলাদেশের জন্য নতুনভাবে নথিভুক্তকরণ (New Record) ইত্যাদি কার্যাবলী বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে "রেড ডাটা বুক অব ভাসকুলার প্লান্টস অব বাংলাদেশ, ভলিউম-৩" প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। 'সার্ভে অব ভাস্কুলার ফ্লোরা অব চিটাগাং এন্ড দ্য চিটাগাং হিল ট্রাক্টস্'' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

পৃথিবীর দুর্যোগ প্রবণ দেশ সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এ দেশের দুর্যোগ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১৯৭০, ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়, ২০০৭ এর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় সিডর, ২০০৯ এর ঘূর্ণিঝড় আইলা, ২০১৩ এর মহাসেন এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা । দেশের জনগণের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগ উত্তর পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের অন্যতম 'ভিশন' হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সার্বিক সক্ষমতা শক্তিশালী করণের মাধ্যমে জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি হ্রাস এবং বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষম একটি জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি একটি দুর্যোগ সহনশীল দেশ গড়ে তোলা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

(ক) প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর পদ্ধতির পরিবর্তে একটি যুগোপযোগী ও সমন্বিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

- আইসিটি নির্ভর মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ ভূমিকম্পের ঝুঁকিমুক্ত নগরায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভুমিকম্পজনিত বিপদাপন্নতা এবং ঝুঁকি বিবেচনা করে দেশের বড় তিনটি শহর যথাঃ ঢাকা, চট্রগ্রাম ও সিলেট ^ মাইক্রোজোনেশনম্যাপ তৈরি করা হয়ে দেশের ঝুঁকিপূর্ণ আরো ৬টি শহর য৷৷৹ ময়মনসিংহ, টাংগাইল, বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী এবং রংপুরের মাইক্রোজোনেশন ম্যাপ তৈরিকরা হয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের সকল বিল্ডিং এর ওপর জরিপ করে একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

(খ) আইন,নীতি,বিধি ও চুক্তি সংক্রান্ত পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- দুর্যোগের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত এবং দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ ও মৌলিক অধিকার রক্ষার চাহিদা পূরণকল্পে যথাযথ আইনি কাঠামো দেয়ার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে;

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে প্রতিপালন এবং নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী প্রণীত হয়। উক্ত স্থায়ী আদেশাবলীতে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্নিকান্ডের মত আপদগুলো অন্তর্ভূক্ত করে ২০১০ সালে স্ট্যান্ডিং অর্ডাস অন ডিজাস্টার্স (এসওডি) সংশোধন করা হয়। সম্প্রতি বজ্রপাত-কে অন্তভুর্ক্ত করে এসওডি'র সংশোধন করা হচ্ছে;

- উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহার উপযোগী রাখা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১ অনুমোদন করা হয়;

- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ প্রকাশ করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ Asian Disaster Reduction Centre (ADRC), Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES), Asian Ministerial Conference on Disaster Reduction (AMCDR) এবং INSARAG

২২৬

(International Search and Rescue Advisory Group) এর সদস্যভুক্ত হয়েছে।

(গ) পরিকল্পনা প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- জাপানের সেনদাইনগরীতে ২০১৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত বিশ্বসম্মেলনে ১৮৭টি দেশের উপস্থিতিতে "সেনদাই ফ্রেম ওয়ার্ক ফর ডিজাষ্টার রিক্সরিডাকশন" গৃহীত হয়। উক্ত ফ্রেম ওয়ার্ক অনুযায়ী বাংলাদেশের জন্য এ্যাকশন প্লান তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় SAARC সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা সমন্বিতকরণের মাধ্যমে সার্ক প্লান অব এ্যাকশন ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (SAARC Plan of Action for Disaster Management) তৈরিতে সহায়তা করছে;

- ২০১০ থেকে ২০১৫ সালের জন্য প্রণীত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যবর্তী মূল্যায়নের কাজ শেষ হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তী জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করা হচ্ছে।

- ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সী প্লান তৈরি করা হয়েছে। দ্রুত সাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ, তিতাস, টিএন্ডটি, ওয়াসা এর কন্টিনজেন্সী প্লান প্রণয়ন করা হয়েছে।

- দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছ্বাস জনিত বন্যার স্থানভিত্তিক গভীরতার তথ্য নির্ভর ইনআনডেশন ম্যাপ/রিস্ক ম্যাপ ফর স্টর্মসার্জ তৈরি করা হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণে ঝুঁকি মানচিত্র হতে এ সকল এলাকার ঘর-বাড়ির ভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে এবং রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচু করতে হবে তার ধারণা পাওয়া যাবে।

- কার্যকর দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে বাংলাদেশে Incident Management System সংক্রান্ত গাইডলাইন প্রণয়নের কাজ চলছে। এছাড়া Debris Management গাইডলাইন প্রয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া ভূমিকম্প পরবর্তী ধ্বংসাবশেষ অপসারণের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটির জন্য পৃথক Debris Management Plan, Debris Management Guidelines ও Dead Body Management Plan এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

(ঘ) সচেতনতা ও শিক্ষামূলক পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- ছাত্রছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩য় শ্রেণি হতে দ্বাদশশ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে;

- দুর্যোগ ব্যবস্থপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে মোট ৪১টি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস্ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ের উপর অর্নাস ও মাষ্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ বিষয়ক মাস্টার্স/ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে।

- সরকারি ও বেসরকারি (NGO) প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমতা ও সমন্বয় আনয়নের লক্ষ্যে Harmonized Training Module এবং প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

(ঙ) প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব পালনকারী বিভিন্ন সংস্থা যেমন, বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, কারারক্ষী, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি)-এর সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন এনজিও (যেমনঃ নারী কনসোর্টিয়াম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, এ্যাকশন এইড-র

সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)-দের জন্য ১৪-১৬ জানুয়ারি ২০১৬ Solar Photoboltaic System and Application শীর্ষক প্রায়গিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তি ইনষ্টিটিউট এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে।
- জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের (ডিআরআরও) সম্মেলনে সারাদেশ হতে আগত কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে
- ডিআরআরও এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) সহমোট ৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দুই মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ হতে শুরু হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
- **ECRRP-D1** প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের মোট ৩,২০০ কর্মচারিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **ECRRP-D1** প্রকল্পের আওতায় Damage and Need Assessment (DNA) Cellস্থাপন করা হয়েছে এবং দেশের ৬৪টি জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের SoS এবং D-Form Online এ পূরণ করার নিমিত্ত DNA Software এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **ECRRP-D1** প্রকল্পের আওতায় Multi Hazard Risk and Vulnerability Assessement (MRVA) Cell স্থাপন করা হয়েছে। দেশব্যাপি ৮টি বড় ধরনের আপদের (বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস, খরা, প্রযুক্তিগত ও স্বাস্থ্যগত) বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি ম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ।

(চ) দুর্যোগ প্রশমন,যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও অবকাঠামো উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ/ব্যবস্থা

- ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে উ কার্যক্রম পরিচালনায় যন্ত্রপাতি ক্র ... 'Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation on Earthquake and Other Disasterss' প্রকল্পের ২য় ফেজে ১৫৩.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে রেসকিউ ভেহিকেল, পিকআপ, রিচার্জেবল সার্চলাইট, ফোল্ডেবল ষ্ট্রেচার, বডিব্যাগ, ফেস/গ্যাসমাস্ক, রেসকিউ ইক্যুইপমেন্ট ফর ভলান্টিয়ার্স ও সার্চ ক্যামেরা ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ECRRP-D1 প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় জরুরী সাড়া প্রদানের জন্য ১২ টি পিকআপ ভ্যান, সিডর বিধ্বস্ত ১২টি জেলা ও ৩৫টি উপজেলায় ব্যবহারের জন্য মেগাফোন সাইরেন সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ৬টি ওয়াটার এ্যাম্বুলেন্স, ১২টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট এবং ৪টি Rough Sea Aquatic Search & Rescue Boat ক্রয় করে উপকূলীয় ১২টি জেলা প্রশাসন, কোষ্ট গার্ড ও র‍্যাব-কে দেয়া হয়েছে। ১৩টি স্যাটেলাইট ফোন ক্রয় করা হয়েছে, যা উপকূলীয় ১৩টি জেলা প্রশাসনে হস্তান্তর করা হবে।
- ঢাকা ও সিলেট শহরে আরবান রেজিলিয়েন্ট প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে ১২০ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮১ কোটি টাকা জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্ধার ও অনুসন্ধান কার্যের সঙ্গে সম্পৃক্তদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে। অবশিষ্ট অর্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনষ্টিউট স্থাপন ও NDRCC শক্তিশালী করণ খাতে ব্যয় করা হবে। ইতিমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত NDRCC শক্তিশালী করণের কাজ চলছে এবং NDMRTI- এর কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলার ১৯টি উপজেলায় দুর্যোগকালীণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে লবনাক্ত পানির পরিবর্তে নিরাপদ লবনাক্ততামুক্ত খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জাপান সরকারের ১৮৯০৫.৬০ লক্ষ টাকা অনুদানে 'প্রকিউরমেন্ট অব স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (২ টন মাউন্টেড)' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় লবনাক্ত পানি পরিশোধনের জন্য ৩০টি স্যালাইন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট সংগৃহীত

হয়েছে, যার প্রতিটি ২ টন ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রাকের উপরে স্থাপিত।

- **ছোট ছোট ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণঃ** গ্রামীণ রাস্তায় জলাবদ্ধতা দূর করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৬১টি জেলার ৪৯০টি উপজেলায় ৪,৮০৪টি (৪৭,৫৩০মিঃ) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। চলমান ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫,৬৪৬টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। জানুয়ারি, ২০১৬ হতে শুরু হয়ে প্রকল্পটি জুন ২০১৯ পর্যন্ত চলবে এবং সর্বমোট ১২,৯৯৩টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। পৃথক প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরে পার্বত্য এলাকায় ৫০৭টি ছোট ছোট (১২ মিটার পর্যন্ত) ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৬ বছরে সমাপ্ত এ প্রকল্পে ৩টি পাবর্ত্য জেলার ২৫টি উপজেলায় ১৯৬টি ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

- 'উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য়পর্যায়)' প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় দুর্যোগকালে দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান; গবাদি পশু এবং গৃহস্থলীর মূল্যবান সম্পদ ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী দুর্যোগের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা এবং দুর্যোগকালীন সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র গুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য জনহিতকরণ কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত ১৬টি জেলার ৮৬টি উপজেলায় সর্বমোট ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্র ৫৩৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৬ হতে শুরু হয়েছে এবং জুন ২০১৯ পর্যন্ত চলবে।

- বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকার দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের নিমিত্ত 'বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)' আওতায় এর ৪৩টি জেলার ১৫৪টি উপজেলায় সর্বমোট ১৫৬টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৮৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৭২টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের কাজ গড়ে ৭৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। জুন, ২০১৭ এর মধ্যে এগুলো সম্পন্ন হবে।

দুর্যোগ পূর্ববর্তী সতর্কীকরণ সংকেত এবং জরুরি সাড়া প্রদান কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি প্রবণ দেশ। এরমধ্যে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা অন্যতম। আগাম সর্তকবার্তা দুর্যোগের ঝুঁকি বা ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে অত্যন্ত সহায়ক। দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রদানে ক্রমান্বয়ে অগ্রগতির কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে অতীতের চেয়ে বর্তমানে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক ভাবে অনেক হ্রাস পেয়েছে। এ লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত তিনটি পদ্ধতিতে দুর্যোগ বার্তা প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

ক) দুর্যোগের আগাম বার্তা ওয়েবসাইট, ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়। এজন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সাথে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ওয়েবসাইটের লিংক স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) ইন্টারেকটিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)ঃ আবহাওয়া ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও আগাম সতর্ক বার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সর্ব সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য দেশের সকল মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে Interactive Voice Response (IVR) সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে যেকোন মোবাইল ফোন থেকে ১০৯৪১ কোড ডায়াল করে তারপর ১ ডায়াল করলে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা; ২ ডায়াল করলে নদীবন্দর সমূহের জন্য সতর্ক বার্তা; ৩ ডায়াল করলে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা; ৪ ডায়াল করলে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত এবং ৫ ডায়াল করলে নদ/নদীর পানি হ্রাস ও বৃদ্ধির অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অবহিত হওয়া যাবে।

(গ) মোবাইল ক্ষুদ্র বার্তা বা Short Message Service (SMS)ঃ মোবাইল ক্ষুদ্র বার্তা মন্ত্রণালয়ের- (১) দুর্যোগের সকল কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত, (২) অভ্যন্তরীণ সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং (৩) গণসচেতনতা ও প্রচার মাধ্যমের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সহায়তা করে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ওয়েবসাইট ব্যবহার করে যে কোন ক্ষুদ্র বার্তা যে কোন মোবাইল ব্যবহারকারীকে খুব অল্প সময়ে পাঠানো সম্ভব। এ লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য- সচিবদের নিকট

প্রয়োজনানুযায়ী দুর্যোগকালীন/পরবর্তী সময়ে সচেতনতা মূলক বার্তা (SMS) প্রেরণ করা হয়।

৬৪টি জেলা ও ৪৮৫টি উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে অত্যাধুনিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র (ডিএমআইসি) স্থাপন করা হয়েছে।

এলাকার মানচিত্র, সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকদের ডাটাবেজ ও ই-লাইব্রেরি ইত্যাদি তথ্য সেবা অনলাইনে পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

এখানে ওয়েববেজড এপলিকেশনের মাধ্যমে দুর্যোগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য সেবা পাওয়া যা
যেমনঃ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের তথ্য, দুর্যোগের ঝুঁক
মানচিত্র, ঘূর্ণিঝড়ের ও জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাব্য প্লাবিত